হাম্পিতে পম্পাসূত্র

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

স্কন্দপুরাণ বলে, বিষ্ণুর বরাহ অবতার একদিন বরাহ পর্বতে বিশ্রামরত। হঠাৎ একদিন তাঁর সম্মুখের দুটি দাঁত থেকে টসটস করে মুক্তোর মতো জলের ফোঁটা গড়াতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে সেই জল দুটি ধারা হয়ে তিরতির করে বয়ে চলেছিল দুটি নদী হয়ে, যারা আজকের পশ্চিমঘাট পর্বতমালা থেকে উদ্ভূত দুই ভগিনী তুঙ্গা আর ভদ্রা। আর তারপর দুয়ে মিলে তুঙ্গভদ্রা হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিল কর্ণাটকের অন্যতম প্রধান নদী কৃষ্ণায়। সেই অর্থে কৃষ্ণা এদের মা। আর সারা বিশ্বের মধ্যে এই কৃষ্ণার জলকেই পানের জন্য সবচেয়ে বিশুদ্ধ বলে মনে করা হয়। নদীমাতৃক আমাদের ভারতের ইতিহাস। সনাতন মুনিঋষিদের গল্পকথা কত আছে এমন নদীর তীরে। কথিত, পুরাণের মার্কণ্ডেয় মুনি এই তুঙ্গভদ্রার তীরেই জেগে আছেন।

তুঙ্গভদ্রার তীরে ১৪০০-১৬০০ শতাব্দীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজধানীই আজকের হাম্পি। এর অপর পারে রামায়ণপ্রসিদ্ধ বানরদের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যা। কত রাজবংশের উত্থানপতনের কাহিনির সঙ্গে জড়িত এই রাজ্য। কত কিংবদন্তি, কত গাথা, কত স্বপ্ন ঘিরে ছিল এখানে। বাহমনি সুলতানদের আক্রমণে তা আজ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত। আজও সবটুকুর সাক্ষী বহন করে চলেছে কৃষ্ণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপনদী তুঙ্গভদ্রা। একে ধাত্রীও বলে, কারণ সমগ্র বেদশাস্ত্রকে ধারণ করে আছে এই শান্ত নদী। কথিত আছে, বেদের ভাষ্য লেখা হয়েছিল তুঙ্গভদ্রার তীরেই। ঋষ্যমুখ পাহাড়ের কোলে অসংখ্য গুহা পরিবৃত এই স্থানের একটি প্রকাণ্ড গুহায় রয়েছে অনবদ্য গুহাচিত্র যা আজও অমলিন। এখানে বানর বা বনের নর (বিশেষ আদিবাসী সম্প্রদায়) বাস করত। তারাই বুঝি রামায়ণের বালি, সুগ্রীব। আছে কলাগাছের ঘন অরণ্য। নারকেল গাছের সারি। জোয়ার-ভুট্টার খেত। এসব ঘিরেই রামায়ণের কিংবদন্তি এখনও মুখে মুখে ফেরে। হাম্পি থেকে কিষ্কিন্ধ্যা গিয়ে তার অনেক প্রমাণও মিলল। প্রসঙ্গত, ঝুড়ি নৌকায় নদী পেরিয়ে হাম্পি থেকে কিষ্কিন্ধ্যা যাওয়া যায়। কাছেই বীরপুঙ্গব হনুমানের জন্মস্থান অঞ্জনি পর্বত। প্রচুর পুণ্যার্থী আসেন এই অঞ্চলে। খাড়াই পাহাড়ের ৬২৫টি পাথরের সিঁড়ি ভেঙে তার মাথায় উঠে মানুষ প্রণাম জানিয়ে আসে আঞ্জনেয় পবনসুত হনুমানজীকে। হনুমানজননী অঞ্জনা দেবীও পাহাড়ের মাথায় পূজিতা হন। আঞ্চলিক বিশ্বাস, হনুমানজী আজও বেঁচে আছেন। বালি, সুগ্রীব, হনুমান এঁরা আসলে

অরণ্যসংকুল পার্বত্য অঞ্চলের এক পরোপকারী উপজাতি বা আদিবাসী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পবিত্রতোয়া তুঙ্গভদ্রার প্রাচীন নাম পম্পা। চতুরানন ব্রহ্মার কন্যা ছিলেন এই পম্পা। তিনি কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে বিবাহ করেন। মহাদেব আর পম্পা অর্থাৎ পার্বতীর বিবাহে ধন্য পম্পানগরীর হেমকূট পর্বতে তাই স্বর্ণবৃষ্টি হয়েছিল। আর সেই থেকে তুঙ্গভদ্রার তীরে এই পম্পার নামেই বিজয়নগরের নাম পম্পা বা লোকমুখে হাম্পি হয়ে উঠেছে, যেখানে পাথর এখনও কথা বলে ওঠে। হাম্পি বর্তমানে কর্ণাটক রাজ্যের বেলারি জেলায় অবস্থিত। এখানে মাটির রং লাল। কাছেই লৌহ আকরিকের আড়ত।

এ-নদীর সেই অর্থে কোনও উত্থান-পতন কিছুই হয়নি। এর তীর আবহমান কালে মন্দিরময়তায় আচ্ছন্ন হয়নি বা যুগে যুগে তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠেনি। এমনকী কোনও সুউচ্চ অট্টালিকার ছায়াও প্রতিবিম্বিত হয়নি তুঙ্গভদ্রার জলে—ঠিক যেমনটি আমরা জেনেছিলাম শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তুঙ্গভদ্রার তীরে' পড়ে। তবুও কীসের পথমায়া যা আমাকে টেনে নিয়ে গেল তুঙ্গভদ্রা দেখে হাম্পির দিকে? বিজয়নগরের ইতিহাস, ভূগোল একসময় পাঠ্যপুস্তকে গুলে খাওয়ানো হয়েছিল আমাদের। তাই দেখবার অদম্য ইচ্ছে টেনে নিয়ে এল এতদূরে।

মন্দিরময় বিজয়নগর বা হাম্পির আনাচে কানাচে মন্দির, যাদের অলিন্দে কান পাতলে আজও শোনা যায় সেই গল্প। চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। তার মধ্যে কয়েকটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে আর্কিওলজিকাল সোসাইটি।

বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় ও তাঁর উত্তরসূরিরা ছিলেন শিল্পকলা, স্থাপত্যের একান্ত পৃষ্ঠপোষক। এই স্থানটিও ছিল স্থাপত্যশিল্পের অনুকূল। খ্যাতির চরম উৎকর্ষে উন্নীত করেছিলেন তাঁরা ভারতের ইতিহাসকে। অগণিত, অপর্যাপ্ত ছোট বড় মাঝারি নুড়িপাথরের পাহাড়ের থেকে সংগৃহীত গ্র্যানাইট পাথর দিয়ে তৈরি হল একের পর এক মন্দির, রাজপ্রাসাদ, নাটমন্দির, গোপুরম, পুষ্করিণী, কূপ, রঙ্গমঞ্চ, স্নানঘর, রাজসভা, মুখ্যমণ্ডপ, সভাকক্ষ এবং গর্ভগৃহের ভিত্তি। নদীর জল, পোড়া ইট আর মর্টার বা স্টাকো দিয়ে নির্মিত হল এইসব অট্টালিকা, সৌধের ওপরের অংশ। ফলে কিছু ইট কালের স্রোতে ভেঙে পড়ল। প্রস্তরের প্রাচীরবেষ্টিত কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও বহিঃশত্রু বাহমনি সুলতানদের আগমনে অচিরেই অধিকৃত হয়ে ধ্বংস হল বহু মন্দির, মূর্তি। সময়ের দলিলে কিছু ভগ্নপ্রায় সৌধের মিশে যাওয়ার কথাও রয়েছে। সেগুলি খনন করে এ এস আই দেখভাল করছে। কিন্তু হাম্পি এখনও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে। হারিয়ে গিয়েও হারাল না তার সময়ের দলিল, নথিপত্র, দেওয়ালগাত্রের লিপি। গুটিকয়েক সৌধের গঠনশৈলীতে ইন্দো-ইসলামিক ছোঁয়া। তাই বুঝি সেগুলি শত্রুর করাল হাত থেকে রক্ষা পেল।

যাওয়া হয়েছিল কলকাতা থেকে বিমানে বেঙ্গলুরু ও সেখান থেকে রাতের ট্রেনে হোসাপেট স্টেশন। পরদিন ভোরে অটোরিকশা অপেক্ষা করছিল। প্রকাণ্ড এক গেট 'তালরিগাট্টা' পেরোলাম।

বিজয়নগরের উত্তরপূর্ব দিকের প্রবেশদ্বার এই প্রকাণ্ড পাথরের তোরণ 'তালরিগাট্টা' বা টোল সংগ্রহের স্থান। গায়ে খোদাই করা প্রাচীন লিপিতে যার নাম 'আরিশঙ্করা দেব বাগিলু'। একসময় রাজধানীর পথশুল্ক সংগ্রহের স্থান ছিল এই গেট। এটি ছিল রাজ্যের অন্যতম নিশ্ছিদ্র নিরাপদ প্রাচীর, বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্মিত। দ্বিতল প্রাচীরের প্রথম তলায় নিরাপত্তারক্ষীর আসন; দ্বিতীয় তল দৃষ্টিনন্দন কারুকার্যে উদ্ভাসিত। উত্তর আর দক্ষিণে আঞ্চলিক কিংবদন্তির নায়ক বীরশ্রেষ্ঠ হনুমানের মন্দির। পথের দুপাশে অজস্র পাথরের

টিলার মাঝে রাজধানীতে প্রবেশের পূর্বে এমন সুন্দর পথশুল্ক সংগ্রহের জায়গা রেখে রীতিমতো আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন বিজয়নগরের রাজারা।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াই তুঙ্গভদ্রার বিশাল উন্মুক্ত খাল দেখতে পেয়ে। মধ্যে মধ্যে জেগে ওঠা কচুরিপানার চর। জ্যান্ত মাছ ধরে কেনাবেচা চলছে। হোটেলে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরেই আবার সেই অটোয় চড়ে হাম্পি অভিযান শুরু। সোজা বিঠ্ঠল মন্দিরে। ১৩০০ থেকে ১৫০০ শতাব্দীতে এই মন্দির নির্মিত। প্রবেশ করেই চোখ কেড়ে নিল হাম্পির আইকন, পাথরের এক প্রকাণ্ড রথ। রাজারা স্থাপত্য আর ভাস্কর্যের যথার্থ পৃষ্ঠপোষক হলে এমন 'হেরিটেজ সাইট' সৃষ্টি হয়।

সেখান থেকে ব্যাটারি চালিত খোলা গাড়িতে চড়ে হাম্পির রাজাদের তৈরি বাজার অঞ্চল। আলম্ব পাথরের স্তম্ভের সারি দেখে বোঝা যায় ব্যবসাবাণিজ্যের কী রমরমা ছিল এই স্থানে।

কারুকার্যময় জলাধার

সোনাদানা, তামা, হীরে, চুনি, মশলাপাতি, তৈজসপত্র আর সুতোর তৈরি বস্ত্রের অন্যতম বিপণনকেন্দ্র ছিল এই হাম্পি। তাই বুঝি খ্যাতির শীর্ষে উঠেছিল এ-রাজ্য। রাজপথের দুধারে দোকানের সারি, বাজারপাট। আর পুষ্করিণীতে হত রাজকীয় নৌকার প্রতিযোগিতা। রাজারানিরা বসে দেখতেন দূর থেকে। পাথরের সেই দর্শকাসনটিও অভিনব। রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের দরবারে গান গাইতেন কবি পুরন্দর দাস। তাঁর কবিতা সুরপ্রয়োগে হয়ে উঠত কর্ণাটকের অভিনব উচ্চাঙ্গ রম্যগীতি—যা কর্ণাটক ঘরানার সংগীতের উৎসস্থল। গীতিকার, সুরকার পুরন্দরের জন্য রাজা নির্মাণ করেছিলেন এক বিশেষ মঞ্চ। বিঠ্ঠল মন্দির সংলগ্ন সভাগৃহে আছে ছাপ্পান্নটি 'মিউজিকাল পিলার' বা সা-রে-গা-মা স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলিতে টোকা দিলে বা কান পাতলে নানারকম সুর আজও অনুরণিত হয়। সুর বাঁধতেন বুঝি গায়কেরা এই স্তম্ভগুলি ছুঁয়ে!

এবার মহাদেবের বিরূপাক্ষ মন্দিরে যাওয়ার পথে পড়ল পম্পা কুণ্ড। এই মন্দির চত্বরে আরও অনেক প্রাচীন মন্দির আছে যেগুলির মধ্যে অন্যতম নৃসিংহ মন্দির। এছাড়া উল্লেখযোগ্য বিশালকায় গণেশমূর্তি ও প্রসন্ন গর্ভমাতঙ্গ শিবলিঙ্গ। আছে প্রকাণ্ড হাতিশাল, রানির জন্য নির্মিত বিশেষ জলমহল বা স্নানের ঘর ইত্যাদি। ওপরে উঠে দেখা গেল পম্পানগরীর পুরো চিত্র। এবার রয়্যাল এনক্লোজার। সাতটি দেওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত অঞ্চল। রানিমহলে আটকোণা ওয়াচ টাওয়ারে থাকত পাহারারত সেপাই। তবুও বহিঃশত্রুর আক্রমণের কবলে পড়তে হয়েছিল হাম্পিকে। সেটাই ছিল দুর্ভাগ্যজনক।

এবার পা বাড়ানো প্রসন্ন বিরূপাক্ষ শিবমন্দিরের দিকে। মন্দিরের চারধারে সাতটি দালান-বিশিষ্ট মণ্ডপ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুখ্যমণ্ডপ, সভামণ্ডপ, রঙ্গমণ্ডপ। এগুলির অনেকটাই সংস্কার

করেছে আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট। মহামণ্ডপের অন্তর্গত ভূতলের গর্ভগৃহে একসময় শিবলিঙ্গ ছিল। মন্দিরতল সমতল থেকে বেশ অনেকটাই নিচে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয়। প্রশস্ত দ্বিতল প্রবেশদ্বার বা গোপুরম। পুবমুখী প্রবেশপথে পাথরের নন্দী এখনও রয়েছেন। তবে তাঁর মুখটি ঈষৎ ভাঙা। মন্দিরগাত্রের প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায় রাজা কৃষ্ণদেব রায় নিজের রাজ্যাভিষেকের সময় নির্মিত এই মন্দিরে প্রচুর দান করেছিলেন। মন্দিরগাত্রে খোদাই করা অপূর্ব সব দেবদেবীর মূর্তি এখনও অক্ষত।

বিরূপাক্ষ মন্দির থেকে বেরুনোর পথে পড়ল কীর্তিমুখ তোরণ। সেখানে লক্ষ্মীনৃসিংহ মূর্তিটি রাজকীয়। মনোলিথিক বা একটিমাত্র পাথরে (mono অর্থাৎ একটি, lithos হল পাথর) খোদাই করা এই স্থাপত্যের অনেকটাই এখনও অক্ষত। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার এই নৃসিংহ মূর্তির উচ্চতা ৬.৭ মিটার। বিশাল আদিশেষ নাগের কুণ্ডলীকৃত শরীরে আসীন এই নরসিংহ মূর্তিটি হাম্পির অভিনব এক স্থাপত্য। নাগরাজ যেন নৃসিংহের ধারণকর্তা। তাঁর সপ্ত ফণার আচ্ছাদনে সুরক্ষিত বিষ্ণুর মস্তক। এই মূর্তির মাথার ওপরের ছাদটি আজ আর নেই। তবে যা আছে তা এখনও নজর কাড়ে। চতুর্ভুজ নরসিংহের হাত আজ অস্ত্রশূন্য। তাঁর বাম কোলে লক্ষ্মী মূর্তিটিও ভেঙে ফেলা হয়েছিল। নরসিংহের মুখাবয়বের অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত। বোঝাই যায় ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তাই উগ্র নরসিংহ মূর্তির উগ্রতা আজ আর বোঝার উপায় নেই। স্থানীয় লিপি থেকে জানা যায়, ১৫২৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে রাজপুরোহিত কৃষ্ণভট্ট এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এবার চোখে পড়ল প্রকাণ্ড এক মোনোলিথিক গণেশ মূর্তির ওপর, স্থানীয় ভাষায় যার নাম ‘কদলিকেলু’ গণেশ অর্থাৎ বৃহদাকার গণপতির মূর্তি। এটি যে সত্যি সত্যি বিশাল সেটি বুঝলাম হেমকূট পাহাড়ের নিচে আর এক গণেশ মন্দিরে গিয়ে যেটির নাম স্থানীয় ভাষায় ‘শশীভেকেলু’ গণেশ। ‘শশীভে’ অর্থাৎ সর্ষের মতো ক্ষুদ্র। মোটেও নয়! আমাদের চর্মচক্ষে এই গণপতিও বেশ বড় তবে কদলিকেলুর চেয়ে অনেকটাই ক্ষুদ্রাকৃতির তিনি।

‘বদভ’ শিবলিঙ্গ

এই মন্দিরগুলিকে একত্রে হেমকূট মন্দিরের দলে ফেলা হয়। অন্তত আর্কিওলজিস্টরা এভাবেই সংরক্ষণ করেছেন। এই দলের অন্তর্ভুক্ত আর একটি মন্দির হল বদভলিঙ্গ শিবমন্দির। হাম্পির বৃহত্তম শিবলিঙ্গ ইনি। একটিমাত্র পাথরে খোদিত শিবলিঙ্গটি জলের মধ্যে স্থাপিত। ৩ মিটার উচ্চ, মাথায় ত্রিনয়ন খোদিত এই শিবলিঙ্গের এমন নাম কেন? স্থানীয় ভাষায় ‘বদভ’-এর অর্থ দরিদ্র। হ্যাঁ, তিনি তো দরিদ্র দেবতা। স্বল্পে সন্তুষ্ট। সামান্য জল, বেলপাতায় খুশি। শোনা যায় এক হতদরিদ্র কৃষকপত্নীর প্রতিষ্ঠিত ইনি। হয়তো তাই এমন নাম। ক্ষুদ্র এক পাথরের প্রকোষ্ঠে প্রকাণ্ড বৃত্তাকার পাথরের যোনিপীঠে আসীন এই শিবমূর্তি। ভোর থেকে পুবের রোদ এসে ভাসিয়ে দেয় সেই ছাদবিহীন কক্ষ। এর একটিমাত্র প্রবেশপথ দর্শনার্থীদের জন্য। এখন লোহার গেট দিয়ে তা বন্ধ করা। গর্ভগৃহের উপরিতল পোড়া ইট

আর স্টাকো দিয়ে নির্মিত ছিল যার অনেকটাই কালের স্রোতে ভগ্নপ্রায়।

এবার একটি অতি আশ্চর্যের বাতাবরণ তৈরি করলেন আমাদের গাইড। রাজবাড়ির একান্ত ব্যক্তিগত অঞ্চলের দিকে পা বাড়ালাম আমরা—রাজবাড়ির অন্দরমহল বা রানিমহল ছিল যেখানে। ইসলাম আধিপত্যের প্রভাবে নাম লেখা 'জেনানা এনক্লোজার'। বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরে এমন এক চৌহদ্দিতে প্রবেশের আগেই চোখে পড়ল সুবিশাল হাতিশাল।

এই হাতিমহলের এগারোটি গম্বুজ ঠিক মসজিদের আকৃতির। ঢুকেই মনে হল যেন বাইরে লেখা আছে 'ট্রেসপাসার্স উইল বি প্রসিকিউটেড'। হ্যাঁ, সত্যি ছিল বইকি। দূর থেকে কঠোরভাবে ওয়াচ টাওয়ারে সর্বক্ষণ চোখ রাখত রানির নিরাপত্তাবাহিনী। তিনটি দোতলা ওয়াচ টাওয়ার ছিল এখানে। এগুলির আকৃতিতেও ইসলামিক স্পর্শ। মূল মহলের নাম 'লোটাস মহল'। অপূর্ব সুন্দর গঠনশৈলী এই মহলের। ঠিক যেন অর্ধ-উন্মুক্ত একটি পদ্মফুলের কুঁড়ি। এর স্থাপত্যশৈলীতেও ইন্দো-ইসলামিক ছোঁয়া, বিজয়নগরের ঐতিহ্যপূর্ণ মন্দিরস্থাপত্যের থেকে যা অনেকটাই পৃথক। এই লোটাস মহল তাই বুঝি অনেকটাই অক্ষত আজও। মূল রানিমহল আজ এক ধ্বংসস্তূপ, যার বেসমেন্টটি এই জেনানা এনক্লোজারের মাঝখানে। এটি হাম্পিতে আবিষ্কৃত সবচেয়ে বৃহৎ নির্মাণকার্য, যার দৈর্ঘ্য ৪৬ মিটার ও প্রস্থ ২৯ মিটার। মূল রানিমহলের উল্টোদিকে ছিল সুবিশাল জলের ট্যাঙ্ক আর ট্রেজারি বিল্ডিং—রাজপরিবারের মেয়েদের গহনাগাঁটি রাখার জন্য সুরক্ষিত স্থান।

আর একটি আশ্চর্য জিনিস দেখা গেল এই মহলে—রানির স্নানঘর। এমন বিশাল রাজকীয় আয়তাকার স্নানঘর সেযুগের এক অভিনব স্থাপত্য নিদর্শন। এর ব্যাপ্তি ৩০ বর্গমিটার। ছশো বছরের পুরনো এই স্থাপত্য হাম্পির অন্যতম আকর্ষণ।

এবার গেলাম বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানীর প্রশাসনিক দফতরে। ৫৯০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে এই সরকারি দফতর ছিল। সরকারি কাজকর্মের জন্য ছিল তেতাল্লিশটি পৃথক পৃথক বাড়ি। দেখা হল শলাপরামর্শের জন্য মাটির নিচে গুপ্তকক্ষ, দুটি বিশাল কুণ্ড, বাইরে থেকে জল নিয়ে আসার জন্য অভিনব পাথরের তৈরি একোয়াডাক্ট এবং সেই জলের সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য সুবন্দোবস্ত, রাজার সভাগৃহ, থাকবার জায়গা, রঙ্গমণ্ডপ 'মহানবমী দিব্যা'। আরও দেখলাম রীতিমতো বাস্তু মেনে নির্মিত 'হাজার রাম' মন্দির। উঁচু একটি ধ্বংসস্তূপে উঠে দেখা গেল হাম্পি শহরের সামগ্রিক দৃশ্য। বেশ সুন্দর ছবি তোলার জায়গা। নিদাঘ চৈত্রের গরমে বেশ বাতাসিয়া স্থান।

ফেরার পথে তুঙ্গভদ্রার তীরে যাই আবারও। নদীর তীরে সাইনবোর্ডে লেখা ঝুলছে, কুমীর থেকে সাবধান! সেযুগেও কি কুমীর ছিল? নিশ্চয়ই নয়। থাকলে শরদিন্দুর নায়ক-নায়িকা অর্জুন আর বিদ্যুন্মালার স্বপ্নভঙ্গ হত। কুমীরের কামড়ে তাদের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হত, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সেযুগেও বিদ্যুন্মালা গোলাকৃতির এক ঝুড়ি নৌকায় পারাপার করত—সেই ঐতিহ্য এখনও বর্তমান। চড়ে বসলাম তেমনই এক ঝুড়ি নৌকা বা কোরাক্যলে। অদ্ভুতভাবে মাঝি ঘুরিয়ে দেয় সেই নৌকাখানি। নদীতীরে বয়ে চলে অদ্ভুত এক প্রশান্তির ঠান্ডা বাতাস। হাওয়ায় তালপাতার শনশন শব্দ আরও যেন মন্ত্রমুগ্ধতা এনে দেয়। নদীর ওপারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শয়ে শয়ে সেযুগের ভাঙা অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ, ঘাটের নিচু ছাদের ঘরে শিবলিঙ্গ, আর নদীর কালো জলে সৃষ্ট হওয়া অজস্র ছোট ছোট ঘূর্ণি, সঙ্গে সূর্যাস্তের রঙের খেলা।

আমার মন পড়ে থাকে 'তুঙ্গভদ্রার তীরে'—বিদ্যুন্মালা, মণিকঙ্কণাদের সঙ্গে।